# মূর্তি গড়া-ভাঙার আলো-আঁধারে বিদ্যাসাগর

সবুজ সেন

মূর্তি গড়া—মূর্তি ভাঙা

মনুষ্যসমাজে মূর্তি নির্মাণ এক প্রাচীন প্রথা। যতদূর জানা যায়, আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মূর্তি নির্মাণের সূত্রপাত। সেযুগের 'ভেনাস', বিশেষত উইলেনডর্ফ এবং ব্র্যাসেম্পাউই ( Brassempouy )-এর 'ভেনাস' মূর্তি তো জগদ্বিখ্যাত। তবে সেগুলো ছিল নিছকই প্রতীকধর্মী—উর্বরতার প্রতীক; প্রজনন-অঙ্গগুলো মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃহৎ। সিন্ধু সভ্যতার যোগী মূর্তি ও মাতৃকা মূর্তিতে দেবত্বগুণ আরোপিত হলেও, সেগুলো অনেকাংশে প্রতীকধর্মী। মাতৃকা মূর্তির যোনিদেশ থেকে নির্গত তরুশাখা তো উর্বরতার চিহ্নই বহন করে। পার্বতীর যোনিদেশে স্থাপিত শিবলিঙ্গও উর্বরতার প্রতীক।

পরবর্তীকালে মূর্তি নির্মিত হতে থাকে দেবত্বকে কেন্দ্র করে। পৌত্তলিকরা যেমন দেব-দেবীর কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করতেন, তেমনই যেসব ব্যক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করা হত তাঁদের মূর্তিও নির্মিত হতো। শুধু ভারতের বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখের মূর্তিই নয়, এমনকি মেরি মাতার ক্রোড়ে যিশুর মূর্তি গীর্জায় স্থান পেত; আজও আছে। সম্ভবত মধ্যযুগেই প্রথা হিসাবেই রাজা-রাজড়া প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মূর্তি নির্মিত হতে থাকে যা আধুনিক যুগে রীতিমতো রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

মানুষের মূর্তি মানুষই গড়ে, আবার মানুষই ভাঙে। সাম্প্রতিককালে মূর্তি ভাঙার সূত্রপাত ছয়ের দশকের চীনে। সাতের দশকে আমরাও প্রত্যক্ষ করলাম রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ 'প্রতিক্রিয়াবাদী'দের মূর্তি ভাঙার তাণ্ডব। সম্প্রতি পূর্বতন সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে শুরু হয়েছে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের মূর্তি ভাঙার রাজসূয় যজ্ঞ। এমনকি খোদ কলকাতার বুকেই লেনিনের মর্মর মূর্তি কালিমালিপ্ত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মূর্তি যাঁদের স্থাপিত হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকের, বিশেষত রাজনীতিকদের মূর্তি শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যে, প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া হয়। কিন্তু এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও বোধ করি সঙ্গত নয় যে, প্রত্যেক মূর্তির অধিকারীরা ছিলেন শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অনুচর। বরং এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয় যে, ব্যক্তি-বিশেষ স্বীয় প্রতিভাবলে নিজ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে এমন এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন যাকে অবজ্ঞা করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। সেইরূপ মৃত ব্যক্তিকে নিজ পক্ষপুটাশ্রয়ী প্রমাণ করার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী যে তাঁদের মূর্তি

নির্মাণে আগ্রহী হবে এতে আর আশ্চর্য কী! যেসব ব্যক্তি একদা ধনতন্ত্রের সমাধি রচনার জন্য জীবনপাত করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও ধনতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা যে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অর্পণ করেন তাও তো আমরা চোখের সামনেই দেখি!

শাসকশ্রেণীর ভূমিকা থাকুক বা না থাকুক একটা কথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। তা হল যেসব ব্যক্তির (বিদেশী, রাজপুরুষ ব্যতীত) মর্মর মূর্তি আমরা পথে-ঘাটে দেখি, যেভাবেই হোক না কেন তাঁদের একটা ভাবমূর্তি সমাজে গড়ে উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও আছে। আসলে মূর্তি নির্মাণ হল এই ভাবমূর্তিরই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এজাতীয় ব্যক্তিরা প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াপন্থী হলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পথ একটাই—তাঁদের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাঁদের প্রচারিত মতের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম।

আর যাঁরা এই মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে ভীত হন, যাঁদের কাছে মতাদর্শগত সংগ্রামের রসদ থাকে না, তাঁরাই ব্যক্তিবিশেষের ভাবমূর্তিকে আঘাত করার পরিবর্তে পরিকল্পিত-ভাবে আঘাত করেন তাঁদের অস্তিত্বের জড়ীচহ্ন—মূর্তিকে। এক কথায় বলা যায় যে, একটি রণকৌশল হিসেবে মূর্তি ভাঙার মূল কারণ হল রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা।* আজ যে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের মূর্তি ভাঙার তাণ্ডব চলছে তাও উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার উলঙ্গ প্রকাশ মাত্র।

একশ দু' বছর আগে মৃত বিদ্যাসাগরের মূর্তি আজও যদি ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে তাহলে বুঝতে হয় যে এখনও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবমূর্তি বাংলায়—দুই বাংলায় —সমুজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁকে কেন্দ্র করে যত সত্য-মিথ্যা কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল তাতে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র-পুত্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' এবং বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিত 'ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক বিচারে অনেক বিষয়ই ধরা পড়ে। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই সমাজে যে তাঁর একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল—এগুলো তারই প্রমাণ। আসলে যেটা বিচার্য, তা হল এই ভাবমূর্তির ভিত্তি কতটা মেকি আর কতটা বাস্তব এবং আজও সমাজে বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের কোনো তাৎপর্য আছে কিনা।

□ ২ □

প্রেক্ষাপট

১৭৯৩—পশ্চিম ইওরোপের ল্যান্ড লর্ডিসম্-এর নিষ্ফল অনুকরণে কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। সৃষ্টি হল নতুন একদল পরগাছা জমিদারশ্রেণীর। এর সঙ্গে আছে ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি-ব্রিটিশ রাজপুরুষদের দেওয়ান। রাজশক্তির প্রযত্নে

*দ্রষ্টব্য—অমল ঘোষ ছদ্মনামে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত 'মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর'।

লালিত-পালিত এইসব নতুন ধনী সম্প্রদায়ের ধন-প্রাচুর্য, বিলাস-ব্যসনে, ইংরেজ-তোষণে উনিশ শতকের নতুন কলকাতা শহর মুখরিত। নতুন রাজা-মহারাজার উদ্ভব তখন প্রায় নিত্য ঘটনা। শোভাবাজারের রাজবাড়ির ভাগ্যোদয় এ বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশক, অবশ্য তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। গোবিন্দপুরের নতুন কেল্লা বানাবার সময় বাস্তুচ্যুত নবকৃষ্ণের পিতার স্থান মিলল সুতানুটির শোভাবাজারে। ক্লাইভের বেনিয়ান লক্ষ্মীকান্ত ধরের কাছে ভাল পারসি জানা নবকৃষ্ণের কেরানির চাকরি প্রাপ্তি। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময় নবকৃষ্ণ উন্নীত হলেন ইংরেজদের হিন্দু মুনশির পদে। আর পলাশির যুদ্ধ জয়ে পরিতৃপ্ত ক্লাইভের কাছ থেকে পারিতোষিক হিসেবে নবকৃষ্ণ প্রথম দফায় পেলেন দশ-হাজারি মনসবদারি এবং 'রাজা বাহাদুর' খেতাব, আর পরের বছর নতুন খেতাব—মহারাজা বাহাদুর। শুদ্ধ লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ নয়, ভ্যানসিটার্টের দেওয়ান রামচরণ রায়, ভেরেলস্ট্-এর দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, হেস্টিংস-এর দেওয়ান কান্তবাবু রায়রায়া, রাজা গুরুদাস এবং পরে মহারাজ রাজবল্লভ প্রমুখ প্রত্যেক নব্য ধনীদের ভাগ্যসূর্য একইভাবে উদিত হয়েছিল।

উনিশ শতক শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা বাদ দিলেও, দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ এবং ১৮২৪-এ এক ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা। পরে অবশ্য ১৮২৬-এ গোলদিঘির উত্তরে একই প্রাঙ্গণে দুই কলেজের নতুন বাড়ি। আরবি-ফারসি তখনো চুটিয়ে চলছে। ইংরেজ বণিকদের কাছে চাকরি করার জন্য কমপক্ষে 'ইয়েস স্যার' 'নো স্যার' জানা লোক চাই। আর তার জন্য ছিল বেশ কিছু পাঠশালা গোছের বিদ্যালয় যেখানে ইংরেজি শব্দ এবং সেগুলোর অর্থ মুখস্থ করানো হতো। এরই মধ্যে রামমোহন রায় ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক পত্রে দাবি করে বসলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের। সেই চিঠির প্রতিক্রিয়ায় নাকি অন্য কোনো মতলবে চালু হল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। তার কিছু যে ফল ফলল তার প্রমাণ হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাঁরা প্রত্যেকেই ১৮৩০-৪০-এর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সীমিতভাবে হলেও নতুন শিক্ষা চালু হল। বের হতে লাগল বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। পাঠকও জুটল। কিন্তু বিত্ত আর শিক্ষার পলেস্তারায় চাপা পড়ল না সনাতনী হিন্দু মন। অন্ধকারময়তা, সর্বপ্রকার কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করার নতুন মাত্রা পেল নবার্জিত বিত্তে। বিলাস, মহাসমারোহে পূজা, বুলবুলির লড়াই, বাইজিনাচ, মদ্যপান, বৌবাজারের রূপচাঁদ পক্ষীর গাঁজার আখড়ায় আটকা পড়ল নব্য বিত্তবানরা। যেসব বাংলা পত্র-পত্রিকার প্রকাশ পেতে লাগল সেগুলোতেও অশ্লীলতা ও বিকৃত রুচি পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠকদের মন জয় করার চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম গুরু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা সংকলন করতে গিয়ে লিখলেন, 'সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা

সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।)

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে উনিশ শতকের একটি পত্রিকা—'দুর্জ্জনদমন মহানবমী'-র ১৮৪৭-এর একটি সংখ্যা থেকে একটি পদ্য উদ্ধার করেছেন, যেটির প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ নিয়মমাফিক সাজালে দাঁড়ায় : 'ঈশ্বর গুপ্ত তোর বাপের গালে হা···'।

রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডুকতা, শাস্ত্র নির্দেশিত মতের অলঙ্ঘনীয়তা, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি যেমন উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের একাংশকে গ্রাস করেছিল, তেমনই আবার এরই মধ্যে উত্থিত হল এক নব্য যুব সম্প্রদায়। আধুনিক ভারতের প্রথম আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও ১৮৩১-এ হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হলেও, ডিরোজিওপন্থীরা অতি অল্পকালের মধ্যেই বাংলায় এক ঝড় তুলতে সমর্থ হলেন। গড়ে উঠল 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন—প্রধানত ডিরোজিও-শিষ্য রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকদের একাংশ শামিল হলেন এই আন্দোলনে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-আদর্শ-যুক্তিবাদ—সবকিছুই তাঁদের ছিল। কিন্তু যা ছিল না তা হল সমাজকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই তাঁরা সমাজকে দেখলেন নিজেদের প্রতিবিম্বর মাধ্যমে। রাতারাতি সমাজের সংস্কার চাইলেন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে আঘাত করলেন সমাজকে, অনেকেরই স্বধর্ম ত্যাগ করাকেই সমাজ সংস্কারের পথ বলে ভ্রান্তি জন্মাল। ফলে ঝড় ক্রমশ মন্দীভূত হল—আর 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনকারীরা পরিণত হলেন একজন প্রতিভাবান কিন্তু শিকড়হীন প্রতিবাদীতে। ফলে, তাঁদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ প্রকাশিত অনেক যুক্তিনিষ্ঠ কথা, এমনকি বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও, মানুষ কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করলেন না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজ এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই চলেছে। রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে মানুষের সামনে হাজির হয়েছে—কাজিয়া হয়েছে। তবে ফল বিশেষ একটা কিছু হয়নি। আর এইসব লড়াই সীমাবদ্ধ থেকেছে মধ্যবিত্তের মধ্যে। তা যেমন স্পর্শ করেনি সাধারণ মানুষকে আবার তা সেই পর্যায়ে সম্ভবও ছিল না। আর এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের উদয়!

□ ৩ □

কোন পথে

ঈশ্বরচন্দ্র জমিদারতনয় বা ধনীর দুলাল ছিলেন না। দুর্জয় সাহসী স্পষ্টবক্তা পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সাংসারিক নীচতা সহ্য করতে না পেরে আদি বাসভূমি বনমালিপুর তথা সংসার পরিত্যাগ, অসহায় কিন্তু তেজস্বিনী পিতামহীর প্রথমে পিত্রালয়ে অবস্থান এবং পরে পৃথক কুটিরে প্রধানত স্বোপার্জিত অর্থে ঠাকুরদাসসহ অন্যান্য পুত্র-কন্যার লালন-পালন—ঈশ্বরচন্দ্রের বংশধারার চিত্র কিছুটা প্রকাশ করে। ১৮০৪-০৫ সালে অর্থাভাবে পেতলের থালা-ঘটি ও কিছু পয়সা সম্বল করে ১৪-১৫ বছরের কিশোর ঠাকুরদাসের কলকাতায় আগমন। পরাশ্রয়ে থেকে কিছুটা ইংরেজি শিক্ষা পরে মাসিক দুটাকা বেতনে চাকরিতে যোগদান। পরাশ্রয়ে থেকেই ঠাকুরদাসের মাস মাইনে দুটাকা থেকে শেষ পর্যন্ত দশটাকা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের ন' বছর বয়সে কলকাতায় পদার্পণ, ১৮২৯-এর ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি। এবং অবশেষে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে, গৃহস্থালী কাজকর্ম করে, চাকরিজনিত পরিশ্রমে বিধ্বস্ত ঠাকুরদাসের সাহায্যে ১৮৪১-এর ৪ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে পরিণত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন বাংলা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল'। প্রথমে ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', পরে ডিরোজিও-অনুগামীদের দ্বারা 'লিপি-লিখন সভা' এবং অবশেষে ১৮৩৮-এ 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব সভা-বিতর্ক-লিপি বিনিময়ের মাধ্যমে নব্য যুবকদের মনে জ্ঞানস্পৃহা, যুক্তিস্পৃহা এবং স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা জাগরিত হল। অবস্থাটা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছুল যে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন, 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না ; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল ; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।'

আবার যেবছর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন, ঠিক সেইবছরে—১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা রদ করা হল।

সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীনই একই চত্বরে অবস্থিত হিন্দু কলেজে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঈশ্বরচন্দ্র স্বচক্ষে দেখেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'ইয়ং-বেঙ্গল'-এর অনেক সদস্যদের আদব-কায়দা-রীতি-নীতি। তাঁদের জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা—

যুক্তিবাদের প্রতি অনুরাগ বিদ্যাসাগরকে নিশ্চয় আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু সে দলে তিনি যোগ দেননি। আবার অচলায়তন সমাজের রক্ষণশীলতাও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। পণ্ডিতকুলে তাঁর জন্ম। জন্মস্থান বীরসিংহ ও মার মামার বাড়ি পাতুল গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, দুলে-বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের বাল্যসাথীদের অশিক্ষা-জনিত আচরণ, বড়বাজারের দয়েহাটায় আশ্রয়দাতা ভাগবতচরণ সিংহের কন্যা রাইমণি দেবীর বৈধব্যজনিত কষ্ট এবং সর্বোপরি পারিবারিক দারিদ্র তাঁকে সমাজকে চিনতে সাহায্য করেছিল। দারিদ্র-অশিক্ষা-সংস্কার কাকে বলে তা কেতাব পড়ে তাঁকে জানতে হয়নি, নিজের জীবন দিয়েই তিনি জেনেছিলেন। এবং এটাও বুঝেছিলেন সমাজকে অন্ধ বিশ্বাস-কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষ মানুষের যোগ্য সমাদর পাবে না। কিন্তু পথ কোথায়?

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে দুটি অভিজ্ঞতা খুব স্পষ্ট ছিল। প্রথমত রামমোহনের প্রচেষ্টা এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রকৃতি। ডিইস্ট মতবাদে বিশ্বাসী রামমোহন সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হিসেবে প্রথমে গড়ে তোলেন 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রহ্মসভা' (১৮২৮)। যদিও রামমোহন রচিত 'ট্রাস্টডিড'-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' শব্দটি কোথাও উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরই রামমোহন প্রবর্তিত হিন্দু ধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টা এক নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করে—'ব্রাহ্মধর্ম'। আর কীভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের অনুগামীরা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তা তো বিদ্যাসাগর স্বচক্ষেই দেখেছিলেন।

সেকারণে বিদ্যাসাগর বেছে নিলেন এক নতুন পথ—যে পথে তাঁর আগে আর কেউ হাঁটেননি, এমনকি রামমোহনও নয়। সে পথ হল একদিকে হিন্দু পণ্ডিতের সাজে সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখা, শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা এবং সমাজকে অন্ধতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা, অপরদিকে ধর্ম সম্পর্কে চরম ঔদাসিন্য। এই কারণে ধুতি-চাদর-তালতলার চটি পরিহিত হিন্দু পণ্ডিতের অনেক কথাই বেশ কিছু মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে বাধ্য হতেন। তাঁকে 'খেরেস্তান' বা 'বেহ্ম' বলে উপেক্ষা করার রাস্তা তিনি রক্ষণশীলদের সামনে খুলে রাখেননি। এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের বাস্তবজ্ঞানের পরিচয়।

পণ্ডিত বংশের সন্তান ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিল বহুকষ্টে মানুষ করা ঈশ্বরচন্দ্র নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। তাহলে তাঁদের আর গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা হবে না। কিন্তু সমাজ বিকাশের ধারা নিয়ে চলল সম্পূর্ণ অন্য পথে। তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বোধ সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১-এ যোগ দিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে।

শিক্ষা—সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার

সমাজকে সর্বপ্রকার কূপমণ্ডুকতা, অন্ধকারময়তা থেকে উদ্ধার করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বেছে নিলেন শিক্ষাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঁচ বছর চাকরি করার সময় আয়ত্ত করে ফেললেন ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা। ১৮৪৬-এর এপ্রিল থেকে ১৮৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত—এক বছর তিন মাস সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে চাকরি করেই ইস্তফা। এরপর জানুয়ারি, ১৮৫১ থেকে অক্টোবর, ১৮৫৮ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থেকে আবার ইস্তফা। দু-দুবার ইস্তফা—দুবারই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে। আর এই মতানৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করলেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা প্রকাশ পায়।

সীমিত ক্ষমতার অধিকারী সহকারী সম্পাদক বেশি উদ্যোগী হয়ে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। হেতু—শিক্ষা প্রণালীর পুনর্বিন্যাসের জন্য সহকারী সম্পাদকের প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাসংসদে পেশ করার জন্য লিখিত সুপারিশ। কীভাবে হীনম্মন্য এবং অকর্মণ্য রসময়বাবু ঈশ্বরচন্দ্রের এই সুপারিশ শিক্ষাসংসদে পেশ করার ক্ষেত্রে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখানে সে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু দুটি বিষয়, লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের মত ছিল ব্যাকরণ আয়ত্ত করার জন্য দু বছরের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন, 'I have carefully studied the working of the system, and the suggestion made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the western world.'

এই উদ্ধৃতির শেষ কটি লাইন, বিশেষ করে 'such a training' থেকে 'western world'—এই বাক্যাংশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিদ্যাসাগরের মূল শিক্ষাচিন্তা। Vernacular dialects—মাতৃভাষায় শিক্ষাচর্চাই ছিল বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষার মূল কথা। কিন্তু সরাসরি মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার অবস্থা তো তখন ছিল না,—বাংলা ভাষায় বই নেই বললেই চলে, চলনসই গোছের গদ্য লেখার উপযুক্ত লেখক নেই, এমনকি বাংলা গদ্য লেখার রীতিটাই তখন অজ্ঞাত। রামমোহন সর্বপ্রথম অন্বয় প্রথার প্রচলন করলেও, বিদ্যাসাগরের আগে কেউ বাংলা গদ্যে যতিচিহ্ন—কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার করেননি। তাই বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু সেই সংস্কৃত টুলো-পণ্ডিতদের সংস্কৃত নয়, এমন সংস্কৃত যা সহজবোধ্য এবং সহজসাধ্য। সংস্কৃত ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্য ভাঙার জন্যই বিদাসাগরকে রচনা করতে হয়েছিল—'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। সে অবশ্য পরের কথা। এই সুপারিশে

লিপিবদ্ধ বিদ্যাসাগরের এই মতটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, মাতৃভাষাকে 'বিজ্ঞান এবং পশ্চিমী দুনিয়ার সভ্যতা'-র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শিক্ষক জীবনে তাঁকে ঘুরে ফিরে এই কথাগুলোয় বার-বার ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ বিদ্যাসাগর জানতেন যে, ইংরেজরা বিদেশি প্রভু হোক, দেশকে লুটেপুটে খাক, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো জাত নেই। বিষাক্ত পরিবেশে নিমজ্জমান মানুষকে উদ্ধারের জন্য চাই সতেজ বাতাস আর আলো। আর সেযুগে তা যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই বহন করতে পারত—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

১৮৫১-তে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলেন, তখন তিনি আরও পরিণত। কিন্তু শিক্ষাচিন্তার মূলগত কোনো পার্থক্য ঘটেনি। ১৮৫২-র ১২ এপ্রিল হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর প্রণয়ন করলেন 'Notes on the Sanskrit College'। উদ্দেশ্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার। এবারের সুপারিশ অবশ্য আরও সুচিন্তিত, আরও পরিণত। তৎকালীন বাংলায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রতিবেদনের প্রথমেই বললেন :

'The creation of an enlightened Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendance of Education in Bengal.'

আবার সেই মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা। যেকোনো ভাষায় বিদ্যাচর্চার তিনটি অপরিহার্য শর্ত হল—শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে উপযোগী করে তোলা। শিক্ষাদানের উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন। বিদ্যাসাগর আজীবন এই তিনটি শর্ত পূরণের চেষ্টা করেছেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩-তে লিখিত একটি পত্রে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা এফ. জে. মুয়েটকে ঈশ্বরচন্দ্র জানান :

'What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of the country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanskrit College should be directed.'

তালতলার চটি-পরিহিত হিন্দু পণ্ডিতের কী দূরদৃষ্টি ! সংস্কারমুক্ত এবং প্রাঞ্জল

বাংলা ভাষায় লেখার উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং নানারকম উপায় উদ্ভাবন। ছাত্রদের মন সংস্কারমুক্ত করার জন্য ২৫ জুলাই, ১৮৫১, তিনি প্রস্তাব করলেন প্রত্যেক অষ্টমী এবং প্রতিপদের ছুটি বাতিল করে কেবলমাত্র প্রতি রবিবার কলেজ বন্ধ রাখার জন্য। অবশ্য তারও আগে ওই বছরই ২৮ মার্চ তিনি তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তাকে জানালেন :

'I see no objection to the admission of other castes than Bramans and Vaidyas or, in other words, different orders of Shudras, to the Sanskrit College.' (*Unpublished Letters of Vidyasagar*, ed. Arabinda Guha, pp. 5-6)

অবশ্য তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন যেখানে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এক ঝটকায় সকল 'শূদ্র'-র জন্য দ্বার খুলে দিলে সমাজে তুমুল হৈ-চৈ বেধে যাবে। তাই তিনি বললেন—আপাতত শুধু কায়স্থদেরই নেওয়া হোক। তাতেই দেখা গেল কয়েকজন অধ্যাপক এই ব্যবস্থার লিখিত প্রতিবাদ করলেন। (ওই পৃ. ৭-১০)

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক কীভাবে গড়ে তোলা যাবে তার ছক বিদ্যাসাগরের প্রাগুক্ত 'নোটস'-এ আছে—২ থেকে ৫নং অনুচ্ছেদে। এগুলোর মূল কথা একটাই—সংস্কৃত ভাষা এবং ইওরোপীয় আকর থেকে আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুসমন্বয়; মোদ্দা কথা আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা। তা নাহলে সংস্কৃতের মতোই শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় কুলপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আজকাল দেওয়াল-লিখন দেখা যায়—'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব'। বিপ্লবের ধারণা বিদ্যাসাগরের মনোজগতে কিঞ্চিৎ স্থানও দখল করেছিল—এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রত্যয় ছিল যে শিক্ষা চেতনা আনে এবং চেতনাই জনসাধারণকে সর্বপ্রকার অন্ধকারময়তা থেকে মুক্ত করতে পারে।

কর্মোদ্যোগী ঈশ্বরচন্দ্র কে কবে বাংলা ভাষায় বই লিখবে, তার জন্য বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তিনি নিজেই একাজে নেমে পড়লেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে তিনি খান দশেক পাঠ্যপুস্তক বাংলায় লিখে ফেললেন। লেখা হল পরিকল্পনামাফিক —বিদ্যার্থীর বয়স ও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'He is only a Primer maker'। যতই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করুন, কথাটা তো মিথ্যে নয়। সেসময় তো 'Primer maker' -এরই প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর একাজে হাত না দিলে, বাংলা ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব হতো?

বিদ্যাসাগর যেসব পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন, সেগুলোর মূল্যায়ন নতুন করে না করে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মতামত উদ্ধৃত করাই বোধ করি যথেষ্ট :

'এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—তখনো আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান (পেডাগোজিকস)

গড়ে ওঠেনি ; শিক্ষামনোবিজ্ঞানও ছিল অজ্ঞাত। এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ চেয়েছিলেন দেশটাকে ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে ঐহিক পৃথিবীতে, বাস্তব জগতে দাঁড় করাতে। তিনি তাই অপার্থিব ও পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াও মাড়াননি—এমনকি, অনেকটা ঐ কারণেই 'আখ্যানমঞ্জরী'তে ভারতীয়দেরও কারও কথা নেই। এ অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু তখন যে প্রাণের দায়—স্বপ্ন দেখার, কল্পনাপ্রশ্রয়ের সময় তা নয়। ( 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর,' পৃ. ২৫ )

'বোধোদয়'-এ (১৮৫১) বিদ্যাসাগর যেমন ঐহিক পদার্থসমূহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তেমনি 'চরিতাবলী'-র (১৮৫৬) চরিত্রগ্রা হলেন সেইসব দরিদ্র পুরুষ যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে আত্মোন্নতি করেছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই—সাধারণ মানুষকে এইসব দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং মুক্তমনা করা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'Primer maker' কিছু সাহিত্যকর্মও করেছিলেন। সেগুলো অবশ্য মূলত হয় সংস্কৃত নয় ইংরেজি প্লটের অনুকরণে লিখিত। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু লেখায়ও একই ছাপ রয়েছে, তবুও তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহিত্যিকের মর্যাদা তো দেনই নি, উপরন্তু বিদ্যাসাগরীয় ভাষা সম্পর্কে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি। 'সীতার বনবাস' বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'কান্নার জোলাপ'। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সাহিত্যগুণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—উভয় লেখকের রচনাই প্রায় সমান দুর্বোধ্য। ভাষা সম্পর্কে এই দুই লেখকের মধ্যে মতানৈক্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'

মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান—বিদ্যালয় স্থাপন-এর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সাহায্য পেয়েছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু হ্যালিডের কাছ থেকে। ছোটলাট হবার আগে হ্যালিডে শিক্ষাসংসদে যে 'মিনিট' উপস্থাপিত করেন তা বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় রচিত। এবং হ্যালিডেও বিদ্যাসাগরকে দিয়ে বাংলাশিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা লিখিয়ে নেন। সেই পরিকল্পনা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, এটুকুই শুধু জানা থাক যে, হ্যালিডের বক্তব্যের শেষাংশে বলা হল :

'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা মোটামুটি অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক।'

'সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের সকলের মত এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ দক্ষিণা কিছু না থাকাই উচিত।' ( বিনয় ঘোষ, পৃ. ২০১ )

হ্যালিডে ছোটলাট হয়ে বিদ্যাসাগরকে বাংলাশিক্ষা পরিদর্শকের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাদের মধ্যে নানা চাপান-উতোরের পর, অবশেষে হ্যালিডের উদ্যোগেই

বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইনস্পেকটর ( পরে নাম বদলে স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর )-এর পদে ১৮৫৫-এর ১ মে থেকে নিযুক্ত করা হল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব ; তাই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক—মাসিক দুশো টাকা।

বিদ্যাসাগর কর্মযোগী পুরুষ। দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য শিক্ষক তৈরির জন্য 'নর্মাল স্কুল'-এর কথা ভাবলেন—নামমাত্র খরচায় সংস্কৃত কলেজে প্রতিদিন সকালে দুঘণ্টা ক্লাস করে ছমাস অন্তর ষাটজন করে শিক্ষক তৈরির পরিকল্পনা। সরকার অনুমোদন করলে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছেয় অক্ষয়কুমার দত্তকে উচ্চশ্রেণীর ও মধুসূদন বাচস্পতিকে নিম্নশ্রেণীর দায়িত্ব দেওয়া হল। সতেরো বছর বয়সের কম এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি বয়সের ছাত্রদের 'নর্মাল স্কুল'-এ ভর্তি করা হতো না। আর ১৮৫৫-এর মে থেকে '৫৬-এর জানুয়ারির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র নিজ এলাকার প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করলেন। গ্রামে-গ্রামে অবস্থিত 'মডেল স্কুল'-গুলো গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করল এবং 'নর্মাল স্কুল'ও যোগ্য শিক্ষক সরবরাহ করতে লাগল।

এ স্কুলগুলো সবই ছিল ছেলেদের জন্য স্কুল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার কি হবে ? ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন। রামমোহনও কথাটা তুলেছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্যোগে কিছু-কিছু বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। তবে সেগুলো সবই বিদেশীদের প্রচেষ্টায়। ১৮৪৭-এ বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তা হল প্রথম বাঙালিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত প্রকাশ্য মেয়েদের স্কুল। এর জন্য প্যারী সরকার, নবকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের সমাজচ্যুতও হতে হয়েছিল। আর বারাসাত বিদ্যালয়ের অনুকরণে বেথুনও কলকাতায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৫৬ থেকে বেশ কিছু দিন বিদ্যাসাগর এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

প্রথমদিকে ভারত সরকার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। পরবর্তীকালে, বিশেষত ১৮৫৪-এর 'উডস ডেসপ্যাচ'-পর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে ভারত সরকারের নিষ্পৃহতা কিছুটা কাটে। বিশেষত বাংলায় সরকারের এ বিষয়ে মত অনুকূলে—এটা ধারণা করে 'স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর' এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন মডেল স্কুলের মতো গ্রামে-গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে। ১৮৫৭ থেকে মাত্র সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়ায় মোট পঁয়ত্রিশটি স্কুল খোলেন। মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল—১৩০০ ! এবারেই শুরু ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সংঘাত। কারণ সরকার তখন আর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে রাজি নন। এমনকি শিক্ষকদের বকেয়া বেতনও নয়। স্বভাবতই ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এটা ছিল অমানবিক ও অনৈতিক কাজ। নিজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নও ছিল—বিশেষত শিক্ষকদের

বকেয়া বেতনের ব্যাপারে। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সরকারের যে সব চিঠি-চাপাটি চলে তাতে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে বিদেশি সরকার দেশে স্ত্রীশিক্ষা চান না। আর এই উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ৫ অগাস্ট, ১৮৫৮ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর'-এর পদ থেকে বিদ্যাসাগরের ইস্তফা—মাসিক পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি থেকে এক কথায় ইস্তফা!

২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ ভারত সরকার এক চিঠিতে জানান—ঈশ্বরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়-গুলোর জন্য যে তিন হাজার চারশ ঊনচল্লিশ টাকা তিন আনা পাঁচ পয়সা খরচ করেছেন তা সরকার দিয়ে দেবেন। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়গুলো চালানোর জন্য সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোনো অর্থ সাহায্য করলেন না। বিদ্যাসাগরও বসে থাকার লোক নন। স্কুলগুলো চালানোর জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে 'নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভাণ্ডার' খোলেন। এ সত্ত্বেও স্কুলগুলো বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আগ্রহটা দেখার মতো।

সরকারি সাহায্য বা অনুদান ছাড়াও বিদ্যাসাগর যে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা তো সকলেরই জানা, বিশেষত ভগবতী বিদ্যালয় এবং মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। আর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনকে কলেজে উন্নীত করা তো বিদ্যাসাগরের কাছে ইংরেজদের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ! বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যে যুগে শিক্ষাবিজ্ঞান অজ্ঞাত, মনোবিজ্ঞান অপরিস্ফুট, সেইযুগে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের সকলের সামনে অপমান বা দৈহিক শাস্তিদানের ঘোরতর বিরোধী। তাই বলে দুষ্কৃত ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে অন্যভাবে, এমনকি স্কুল থেকে বহিষ্কার করেও। একবার বাদুড়বাগানের বাড়িতে বসে খবর পেলেন যে তাঁর স্কুলের শ্যামপুকুর শাখার একজন শিক্ষক একটি ছাত্রকে গুরুতর দৈহিক শাস্তিদান করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে হেঁটে স্কুল। আর এক কলমের খোঁচায় শিক্ষক মহাশয়টির চাকরি খতম। অনেকের কাছে বিষয়টা একটু বাড়াবাড়ি বা স্বৈরাচারী কাজের নমুনা হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এসব অভিযোগ কিছুটা সত্য বটে, কিন্তু যা ভেবে দেখার প্রয়োজন তা হল, যেখানে বাংলার নামি-নামি অনেক স্কুলে আজও 'দুষ্ট' ছাত্রদের জুতোসুদ্ধ পায়ে লাথি মারতে আধুনিক শিক্ষকদের বাধে না, সেখানে আজ থেকে প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে বিদ্যাসাগর যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তা যে যুগান্তকারী ছিল না তা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫-র মার্চ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ছিলেন কলকাতাস্থ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিশনের কয়েকজন পরিদর্শকের মধ্যে একজন। '৬৩-'৬৪ শিক্ষাবর্ষে এই শিক্ষায়তনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিদর্শকদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে অনৈক্যের কারণে বিদ্যাসাগর পৃথকভাবে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তার এক জায়গায় বলা হল, 'আমার মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না

কেন তার জন্য বালকদের কখনোই দৈহিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। আমি দণ্ডনীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, যে বালকদের দৈহিক, দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়।'

মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা প্রচলনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা কীরকম ছিল তা আমরা দেখলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আকূতিটা কত তীব্র তা তাঁর ৫ অগাস্ট, ১৮৫৮-য় লেখা পদত্যাগ পত্র পড়লেই বোঝা যায়। তিনি ওই চিঠির এক জায়গায় বলেছেন তাঁর বাকি জীবনটা বাংলা বই রচনা, সংকলন এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজেই কাটাবেন। তারপরই বললেন, 'এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে।'

সকলেই জানেন এই কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। এমনকি তিনি যে কুশলী বাংলা গদ্য লেখক অক্ষয় দত্তর সঙ্গে মিলেমিশে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার জন্য কাজ করেছেন যা 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত তাঁর রচনা—এ সবই তো শিক্ষা বিস্তারের অন্তর্ভুক্ত। তবে লোকশিক্ষা—মানুষকে জাগ্রত করার জন্য, মানুষকে মুক্তমনা-যুক্তিবাদী-হৃদয়বান করার জন্য লেখা। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি এত অনুরাগ, দেশের মানুষের প্রতি এত ভালোবাসার উৎস কি নির্ভেজাল দেশপ্রেম ছাড়া আর কিছু হতে পারে?

'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর একসময় অকর্মণ্য, হীনবুদ্ধি সহকর্মীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৬-এর একটি সভায় তাঁর ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কারণ সদস্যরা জানতে চাইলে, তিনি লিখিতভাবে সে কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে এক স্থানে বললেন, 'যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার প্রধান ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ;...' এই যে 'দেশের হিতসাধন'—এরই অপর নাম তো দেশপ্রেম! পরিতাপের বিষয়, বিদ্যাসাগরের জীবৎকালেই অনেকেই তাঁর 'দেশের হিতসাধন'-এর প্রচেষ্টা অনিষ্টসাধন বলে মনে করতেন, আর সম্ভবত আজও অনেকে তা মনে করেন। পার্থক্য শুধু সময়ের ; ঐক্য—মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির!

### ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

বিদ্যাসাগর পোশাক-আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন হিন্দু পণ্ডিতরূপে জনসমক্ষে পরিচিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত রচনাগুলো লিখেছিলেন, সবগুলোতেই শাস্ত্রের দোহাই—শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কাৎ করা। এসব থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি গভীরভাবে হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর হল, তিনি না লিখলেন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে কোনো লেখা না বললেন নিজ ধর্মমতের কথা।

ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মমত একটা প্রহেলিকাই রয়ে গিয়েছে—সবই অনুমানসাপেক্ষ।

তবে এ কথাটা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের করতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত সম্পর্কে নিশ্চুপ, বলা যায় নিরুদ্বিগ্নও। তাই কিছু গল্প বা তাঁর উক্তি থেকেই তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা করা যায়। তিনি যেমন খ্রীস্টানদের সঙ্গেও মিশতেন, ব্রাহ্মদের সঙ্গেও আবার হৃদ্যতা তাঁর কম নয়। ফলে দু-একটা টুকরো ঘটনা উদ্ধার করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের ধর্মমত বোঝার কোনো রাস্তাই নেই।

শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর পিতা মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। একবার তিনি কলকাতায় এলে, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি ইতিমধ্যে গাঁজা-টাজা খাওয়া শুরু করেছেন কিনা? এরকম প্রশ্নে যখন শিবনাথের পিতা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, 'এত সহজ ও সোজা সম্পর্কটা বুঝতে পারলে না? জান তো, লোকের বিশ্বাস কাশীতে যাঁর মৃত্যু হয় তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন পাঁড় গাঁজাখোর। কাশীতে মৃত্যুর পর যখন শিব হবে তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে? তাই বলছিলাম, মৃত্যুর আগেই যদি একটু প্র্যাকটিস করে রাখতে, তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হতো।'

এরকম অনেক গল্পই আছে। তবে প্রমাণাদি যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বিদ্যাসাগরের দেবমন্দিরে যাওয়ার কোনো অভ্যাস ছিল না আর পারত্রিক পুণ্যার্জনের জন্যও তিনি কোনো মন্দিরে টাকা দান করতেন না। কাশীতে থেকেও বিশ্বনাথ দর্শন করেননি। এমনকি কাশীর পাণ্ডাদেরও তিনি শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব দেখেই নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করেছেন। শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে বিদ্যাসাগর ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। আবার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের দাবি—বিদ্যাসাগর নাস্তিক। কেউ-কেউ অবশ্য বিদ্যাসাগরকে আস্তিক বলতেও ছাড়েননি। তবে বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যি হলে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হয়। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকজন 'কৃতবিদ্য ভদ্রলোক' বিদ্যাসাগরকে একবার ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, 'ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।' এরপর বিদ্যাসাগর পরের জন্য বেত খাওয়া সম্পর্কে একটা গল্প বলার পর বললেন, 'পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক করে আসছে, অনন্তকাল তাই করবে, কোনদিন তার মীমাংসা হবে না। অতএব ধর্মবিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি অনর্থক বেত খেতে পারব না।'

এটাই হল বিদ্যাসাগরের ধর্ম সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁকে নাস্তিকই বলা হোক আর অজ্ঞেয়বাদীই বলা হোক বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্পর্কে কোনোদিন মাথা ঘামাতে চাননি, আর মাথাও ঘামাননি। তাঁর কাছে নিজের বা ব্যক্তিবিশেষের পারত্রিক ব্যাপার-স্যাপার উপেক্ষণীয়, ঐহিক প্রশ্নই তাঁর কাছে শেষ কথা।

যদিও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তাও তিনি স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেননি। ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামতের মধ্যেই ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ মেলে, যদিও তা বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আর ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মমতটাও বোধ করি আরও কিছুটা স্বচ্ছ হয়।

*ডঃ জেমস আর ব্যালেনটাইন ছিলেন বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃতজ্ঞ। সরকারের অনুরোধে ডঃ ব্যালেনটাইন ১৮৫৩, জুলাই-অগাস্ট মাসে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেন। ব্যালেনটাইনের অন্যতম পরামর্শ ছিল দার্শনিক বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" ( *Inquiry* ) পুস্তকটি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কারণ এর দ্বারা ভারতীয় ছাত্ররা ভারতীয় দর্শন এবং ইওরোপীয় দর্শনের মধ্যে ঐক্যের ভাব লক্ষ করবে।

বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী হিন্দু দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য বিভাগ, বিশেষত বেদান্ত এবং সাংখ্য পড়ানোর ব্যবস্থা সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত ছিল। কিছু ইওরোপীয় দর্শনগুলির মধ্যে বার্কলের দর্শন পড়ানো হতো না। ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হলেন। পরিবর্তে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩, কাউন্সিল অব এডুকেশনের তৎকালীন সম্পাদক এফ. জে. মুয়েটকে বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইনের সুপারিশ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রের এক স্থানে তিনি লিখলেন, 'বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" সম্পর্কে আমি এই মতামত ব্যক্ত করতে চাই যে, পাঠ্যপুস্তকরূপে এই বইটির অন্তর্ভুক্তি সুবিধের থেকে অনিষ্টই বেশি করবে। কতকগুলি কারণে, যা এখানে বিবৃত করার প্রয়োজন নেই, আমরা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য পড়াতে বাধ্য হই। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধতা নেই। এই দর্শনগুলি ভ্রান্ত হলেও হিন্দুদের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা আদায় করে থাকে। সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি পাঠক্রমে আমাদের সঠিক দর্শন দ্বারা এগুলির প্রভাব প্রতিরোধ করার এবং এগুলির বিরোধিতা করা আবশ্যক। বিশপ বার্কলের "তত্ত্বান্বেষণ" যা বেদান্ত বা সাংখ্যের সদৃশ বা একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং ইউরোপে যেটিকে এখন আর সঠিক দার্শনিক প্রণালী হিসাবে গণ্য করা হয় না, তা আমাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে না। অপরপক্ষে যখন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ছাত্ররা এই বই পাঠ করে দেখবে যে, বেদান্ত ও সাংখ্যে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহ একজন ইউরোপীয় দার্শনিক দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হচ্ছে, তখন এই দুই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিশপ বার্কলের এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সুপারিশের ক্ষেত্রে আমি ব্যালেনটাইনের সাথে একমত হতে

* ভারতীয় দর্শন সম্পর্কিত অংশটি বর্তমান লেখকের 'এক হিন্দু পণ্ডিত' ( শারদীয়া চেতনা, ১৯৯২ )-এর অংশ বিশেষ।

পারছি না বলে দুঃখিত।' ( বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২, পৃ. ৪৫৩ ; মূল ইংরিজি থেকে অনূদিত )।

বিদ্যাসাগর কী কারণে বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন আর কেনই বা বিশপ বার্কলের দর্শনকে 'সঠিক দর্শন' বলে গণ্য করেননি তা বিদ্যাসাগর রচনায় ব্যাখ্যাত হয়নি। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামতের মূল কারণ বোঝার জন্য বোধ হয় বেদান্ত বা সাংখ্যের সঙ্গে বার্কলের দর্শনের সাদৃশ্য কোথায় সেটি দেখার চেষ্টা করাই ভাল। তাই সংক্ষেপে একবার বিষয়টির ওপর চোখ বোলানো যেতে পারে।

আমরা ইংরেজি 'ফিলসফি' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহার করি। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের অভিমত, 'এস্থলে দৃশ্-ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়।' মহামহোপাধ্যায় আরও বলেন, 'অমরসিংহ বলিয়াছেন—মোক্ষে ধীর্জ্ঞনমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ। মোক্ষ-বিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্রর নাম বিজ্ঞান। প্রকৃতস্থলে দৃশ্-ধাতুর জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ মোক্ষ বিষয়ক-জ্ঞানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। কেননা দর্শনশাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞানসামান্যের সাধন হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে।' ( ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আদি পর্বে উদ্ধৃত, পৃ. ৩-৪ )।

'দর্শনশাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন'—মহামহোপাধ্যায় তর্কালংকারের এই ব্যাখ্যা বিদ্বানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মাত্রই 'মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন'—এটা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। কমপক্ষে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে যে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানচর্চা হয়নি তা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে যে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অপর একটি বিষয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্যে 'ফিলসফি' বা দর্শনশাস্ত্রের যেমন স্বাধীন বিকাশ ঘটেছিল, বেশির ভাগ ভারতীয় দর্শনের তা ঘটেনি। ভারতের বেশির ভাগ দর্শন ধর্মের সঙ্গে এবং কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। ফলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান শাখাগুলিতে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানচর্চা অনিবার্যভাবেই ঈশ্বর বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয়েছে।

বেদের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রসমূহকে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্বীকৃত বিভাগ অনুযায়ী বেদের প্রতি অনুগত অর্থাৎ আস্তিক দর্শনগুলি হল—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা বা মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। অপরদিকে নাস্তিক দর্শন হল লোকায়ত, জৈন এবং বৌদ্ধ। অবশ্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিদ্বান এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত এবং সুচিন্তিত আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি মনে করে থাকে, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মুখনিঃসৃত যে বাণী বেদে স্থান পেয়েছে সেগুলি ঈশ্বর প্রেরিত বাণী এবং এগুলি চিরন্তন ও

অপরিবর্তনীয় সত্য প্রকাশ করেছে। বেদান্ত যে সম্পূর্ণ বেদ অনুগত দর্শন সে বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সাংখ্য দর্শনকে সেইভাবে আস্তিক দর্শন বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সাংখ্য সম্পর্কে আলোচনার আগে বেদান্ত সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সকলেই অবগত আছেন যে, ঐতিহ্যের দিক থেকে বেদের দুটি অংশ—মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা যাগযজ্ঞ। ব্রাহ্মণ অংশের শেষে স্থান পেয়েছে আরণ্যক আর আরণ্যকের শেষে উপনিষদ। আরণ্যক ও উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা বা সমর্থন করাই হল উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য মূল দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দানের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় বাদরায়ন প্রণীত বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে। পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কাছে মূল দার্শনিক গ্রন্থ এই বেদান্তসূত্রই এবং তাঁরা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রন্থেরই নানা ভাষ্য রচনা করেছেন। বেদান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের দুটি উপসম্প্রদায়—অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত। অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাকার হলেন শঙ্করাচার্য। আর বিশিষ্টাদ্বৈত উপসম্প্রদায়ের প্রধান ভাষ্যকার হলেন রামানুজ (একাদশ শতাব্দী)। উভয় সম্প্রদায়ই ব্রহ্মার অস্তিত্বকে প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করেছেন এবং উভয়েরই মতে মোক্ষলাভই ব্যক্তি বিশেষের চরম লক্ষ্য। সামগ্রিকভাবে বেদান্ত দর্শনে আত্মা হল অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর। শঙ্করাচার্য একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে, সেইসব যুক্তি বা তর্কই গণ্য করা যেতে পারে যেগুলি 'শ্রুতি' থেকে স্বতন্ত্র নয়, বরং 'শ্রুতি'র পরিপূরক।

অবশ্য অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত—এই উভয় দর্শনের মধ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট। শঙ্করাচার্যের মতে 'ব্রহ্ম একাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্যক্তি এবং ব্রহ্ম অভিন্ন'। তাঁর আরও মত হল, ব্রহ্ম একান্তভাবেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাবয়ব, নিরুপাধিক (চূড়ান্ত) এবং নির্বিশেষ। তাই ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করার অর্থ হল অজ্ঞানতা। চিৎস্বরূপ আমিই একমাত্র সত্য। আবার জ্ঞানান্বেষণকারী নিজেই অজ্ঞেয়। ফলে পরিদৃশ্যমান সবকিছুই মায়া (*The Cultural Heritage*, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, Vol-III, p. 238-40)।

অপরপক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্গুণরূপে চিহ্নিত করা হয়নি। এই সম্প্রদায়ের কাছে যদিও ব্রহ্মই চূড়ান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়, কিন্তু এক্ষেত্রে জড়জগৎ এবং জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করা হয়েছে। এই দর্শনে বেদান্তজ্ঞান অর্জনের জন্য তিনটি পরস্পর ঐক্যযুক্ত প্রণালী প্রদর্শন করা হয়েছে—তত্ত্ব, হিত এবং পুরুষার্থ। তত্ত্ব হল ব্রহ্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান। (*Cultural Heritage*, Vol-III, p. 300-01)

সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে অধ্যাপক হিরিয়ান্না মন্তব্য করেছেন, 'এই দর্শনের উৎপত্তি এবং

এর মতাদর্শের যৌক্তিক সঙ্গতির বিষয়টি দীর্ঘদিনব্যাপী বিতর্কের বিষয়বস্তু;' (*Cultural Heritage*, Vol-III, p. 41)। অধ্যাপক মূর্তির মতে কপিল, যিনি সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য হন, তিনি একজন পৌরাণিক চরিত্র (ওই, পৃ. ৩৩)। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'সুখের বিষয়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক গার্বে এবং অধ্যাপক জিমার প্রমুখ অন্যান্য আধুনিক বিদ্বানেরা নতুন করে প্রমাণ করেছেন, সাংখ্য দর্শন আদিতে অবধারিত ভাবেই বেদ-বিরুদ্ধ ছিল' (ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯)। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অন্য একটি মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য, 'সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নানা অবান্তর প্রতিপাদ্য বিচারমূলকভাবে বর্জন করলে দেখা যায় যে এই দুটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক সারাংশও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদেরই পরিচায়ক' (লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে যে দুটি উপসংহারে পৌঁছনো যায় তা হল—প্রথমত, আদিতে বেদবিরুদ্ধ থাকলেও সাংখ্য দর্শন পরবর্তীকালে আর বেদ বিরোধী থাকেনি; দ্বিতীয়ত, 'নানা অবান্তর প্রতিপাদ্য বিষয় বিচারমূলকভাবে বর্জন' করার পরই সাংখ্যের বস্তুবাদী অন্তঃসার প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

সাংখ্যের মূল গ্রন্থ বলতে মাত্র ২২টি সূত্রযুক্ত 'তত্ত্ব-সমাস' নামের একটি সংগ্রহ পাওয়া গেছে। এছাড়া সাংখ্য দর্শনের প্রধান গ্রন্থ হল ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত 'সাংখ্য-কারিকা' এবং কপিল রচিত 'সাংখ্য-সূত্র'। সাংখ্য-কারিকাও একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ। সে তুলনায় সাংখ্য-সূত্র কিছুটা বৃহৎ। এবং এই সাংখ্য-সূত্রই সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর গার্বের মতে, সাংখ্য-সূত্র প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-মতে ভরপুর। অধ্যাপক সুরেন দাশগুপ্তের মতে এমনকি ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা, যা দ্বিতীয় বা মতান্তরে পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, তাতেও সাংখ্যের অবিকৃত ব্যাখ্যা নেই। সাংখ্য-কারিকার প্রধানতম ভাষ্যকার গৌড়পাদের রচনায় এবং অপর টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের টীকায় (সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী) যে বেদান্তমত প্রাধান্য পেয়েছে তা সকল বিদ্বানই স্বীকার করেছেন।

সুতরাং সাংখ্য দর্শনের নাস্তিক্যবাদ বা বস্তুবাদী চরিত্র অস্বীকার না করেও একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে আধুনিক গবেষকদের গবেষণার আগে পর্যন্ত সাংখ্যের বস্তুবাদী চরিত্র অজ্ঞাত ছিল এবং সাংখ্য দর্শনের বহুল প্রচারিত গ্রন্থগুলি—'সাংখ্য-সূত্র' এবং 'সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী' বেদান্ত মতে ভরপুর ছিল। এবং বিদ্যাসাগরের সময় সাংখ্য-দর্শনের যে দুটি বিষয় সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য ছিল, সে দুটি হল: কপিলের সাংখ্যসূত্র এবং কৌমুদী বা সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী। সুতরাং বিদ্যাসাগর যদি সাংখ্য দর্শনকে বেদান্ত-অনুগামী বলে মনে করে থাকেন, তাহলে তা তৎকালীন যুগের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে এবং পাঠ্য পুস্তকরূপে গণ্য গ্রন্থ দুটির বিচারে কোনো অন্যায় কাজ বলে গণ্য করা উচিত নয়।

এখন বিশপ বার্কলের দর্শনের অন্তঃসার ব্যক্ত করার আগে ইওরোপীয় দর্শন সম্পর্কে

দু-একটি জানা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। মধ্যযুগীয় ইওরোপে অন্যান্য জ্ঞান-মার্গের মতো দর্শন চর্চাও অধঃপতিত হয়েছিল এবং চার্চ ও ধর্ম জনজীবনে অবিসংবাদী প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। এবং এটাও ইতিহাসসিদ্ধ যে নবজাগরণ বা জাগৃতিকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো দর্শন চর্চাও বিকশিত হয়। এই পর্যায়েই ফ্রান্সিস বেকন, স্পিনোজা, দ্য কার্তে, হবস, লক, ভলতেয়ার প্রমুখ দার্শনিকগণ একদিকে আধুনিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অপরদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধকারময়তা থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টায় রত হন। বেকন, স্পিনোজা, দ্য কার্তে, হবস, লক প্রমুখ দার্শনিকগণ আধুনিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তিবাদও প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ফলে ধ্বনি ওঠে—অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছুই বিচার্য।

বেকন ( ১৫৬১-১৬২৬ ) ঘোষণা করলেন, তাঁর বিখ্যাত নোভাম ওরগানাম-এ 'Man, as the minister and interpreter of nature, does and understand as much as his obesrvations on the order of nature .....permit him ; and neither knows nor is capable of more.' (*The story of Philosophy* Will Durant, 1957, p. 125) আর বেকনীয় দর্শনের অনুগামী জন লক (১৬৩২-১৭০৪ ) বললেন, 'there is nothing in the mind except what was first in the senses.' এবং সিদ্ধান্ত করলেন, যেহেতু কেবলমাত্র জড়পদার্থ আমাদের অনুভূতিকে ( senses ) প্রভাবিত করতে পারে, সেহেতু আমরা বস্তু ( matter) ছাড়া আর কিছুই জানি না, এবং আমাদের অবশ্যই বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে *( The story of Philosophy, p.* 256 )।

এই পর্যায়েই জর্জ বিশপ বার্কলের ( ১৬৮৪-১৭৫৩) উত্থান। ১৭১০-এ প্রকাশিত দার্শনিক বিশপ বার্কলে তাঁর '*Treatise concerning the principles of human knowledge*' গ্রন্থে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিলেন বস্তুবাদীদের। তাঁর কাছে বস্তু হল কতকগুলি ধারণার সমাহার ( 'collection of ideas' )। এবিষয়ে তাঁর একটি উদাহরণ হল, 'যে টেবিলে আমি লিখি, আমি বলি তার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ এটিকে আমি দেখি এবং অনুভব করি ; কিন্তু যদি আমি পাঠকক্ষের বাইরে চলে আসি, আমার বলা উচিত এটির অস্তিত্ব ছিল ; যার অর্থ হল পাঠকক্ষে থাকলে সেটি আমার কাছে পরিদৃশ্যমান হত...'। এই কারণে বার্কলে বললেন, 'আমি একথা ভাবতেই পারি না, যে বস্তুগুলি কেউ দেখছেন সেই পরিদৃশ্যমানতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে কী করে বস্তুর চূড়ান্ত অস্তিত্বের কথা বলা যেতে পারে। অস্তিত্ব থাকার অর্থই হল পরিদৃশ্যমান হওয়া।' বার্কলের এই সিদ্ধান্তের অন্তঃসার একটাই, তা হল চেতনাই প্রধান ; চেতনা আছে বলেই বস্তুর অস্তিত্ব আছে। চেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো অস্তিত্ব বস্তুর থাকতে পারে না। এই কারণেই বার্কলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'বস্তু

শব্দটা সেই অর্থেই ব্যবহার করা যেতে পারে যে অর্থে অন্য ব্যক্তিরা বলেন শূন্য ( nothing )' ( পৃ. ১৯৬-৯৭ )।

এককথায় বিশপ বার্কলের দর্শন ভাববাদী দর্শন। আর এখানেই বার্কলের দর্শন, বেদান্তদর্শন এবং বেদান্তমতে ভরপুর সাংখ্য দর্শনের চিন্তার ঐক্য। এই তিনটি দর্শনের চেতনা মুখ্য, বস্তু বা জড় ( matter ) অপ্রধান। বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই ; চেতনা আছে বলেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। আর সকল ভাববাদী দর্শনই অবধারিতভাবে ঈশ্বর এবং ভাগ্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বিদ্যাসাগর এই ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতা করার জন্যই বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলেছিলেন এবং বার্কলের দর্শন পাঠ্য-সূচির অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ভারতীয় এবং আধুনিক ইওরোপীয় দর্শন সম্পর্কে চিন্তাধারা তাঁর 'Notes on the Sanskrit College' নামক প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'একথা ঠিকই যে হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।' ( বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১ )

### মানবতাবাদ ও অজেয় পৌরুষ

বিদ্যাসাগরের কাছে উপেক্ষণীয় ঈশ্বর-ধর্ম, মানুষ নয়। তাঁর চেতনা-রচনা-কর্ম পরিচালনার গোটা জায়গাটাই যা দখল করে বসে আছে তা মানুষ। পঙ্কে নিমজ্জিত হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের মানুষকে কী করে জাগ্রত করা যায়, কী করে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষে পরিণত করা যায়—এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাই মানুষকে যে কোনো ধরনের অমঙ্গল থেকে রক্ষার প্রয়োজন হলেই বিদ্যাসাগরকে দেখা যেত সর্বাগ্রে—তা কলেরা রোগ থেকে মানুষকে বাঁচানোই হোক, আর নিরন্ন মানুষকে অন্ন-বস্ত্র দানই হোক। ছিল না জাতের বিচার, ছিল না ধর্মের আচার। আবার বলি, পুণ্যার্জনের হাতছানি তাঁকে এব্যাপারে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। মধুসূদন দত্তকে ধার করে বিদেশে দু খেপে আট হাজার টাকা পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল একটা বিপদগ্রস্ত পরিবারকে, একটা প্রতিভাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো।

তাঁর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজেরও মূল অনুপ্রেরণা ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা—নারী সমাজের প্রতি গভীর প্রেম, হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা। তিনি জানতেন যে নারী মুক্ত না হলে এ দেশের কিছু হবে না। এই উদ্দেশ্যেই বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন। বিদ্যাসাগরের উইলটা খুললেই দেখা যায় কত অজ্ঞাত রমণীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা। আর মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার প্রসারের মাধ্যমে তিনি সকল ধর্মাবলম্বী বঙ্গবাসীর জাগ্রত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরের মতো উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেও ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়েছিল। এক সময় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, আর বাৎসরিক সুদ পাঁচ হাজার টাকা। চেষ্টা করেছেন যেন অপাত্রে দান না হয়, তবুও বহু স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁকে প্রতারণা করেছে। যাঁরা বিধবাবিবাহের জন্য অর্থদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁরাও সুযোগ বুঝে সরে পড়েছেন। এমনকি সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি নিজে বিধবাবিবাহের জন্য অঙ্গীকৃত অর্থের অর্ধেক দিয়েছিলেন এবং মাসিক সাহায্যও বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তিনিও তাঁর কাছ থেকে ঋণ করা টাকা পরিশোধের জন্য বিদ্যাসাগরকে তাগাদা দিয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদন কবি। তাই তাঁর কবি-হৃদয় থেকে উৎসারিত নানা বিশেষণে তিনি বিদ্যাসাগরকে বিভূষিত করেছিলেন—'the first man among us', 'genius and wisdom of an ancient sage,' 'the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother', 'করুণাসাগর' ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো কল্পনাবিলাসী ছিলেন না; ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তববাদী এবং বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। সমাজকে সবটা না হলেও অনেকটাই চিনতেন। তাই প্রথমবার সংস্কৃত কলেজ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরপরই ব্যবসা শুরু করেন। তিনি জানতেন, যে পথে তিনি এগুতে চাইছেন—তাতে সংঘাত অনিবার্য—নিজের সংস্থান নিজেরই করতে হবে। বই লিখেছেন, ছেপেছেন, নিজের এবং অন্যের বই বিক্রি করেছেন, দু হাতে উপার্জন করেছেন এবং অকাতরে বিলিয়েছেন। শেষমেশ নিজের ঋণ নিজেই শোধ করে গেছেন।

মানবতাবাদ, বৈষয়িক বুদ্ধি এবং পৌরুষের এমন বিচিত্র সমাহার খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়। মানবতাবাদ যদি তাঁর পথ হয়, তাহলে বৈষয়িক বুদ্ধি এবং পৌরুষ হল তাঁর পাথেয়। তবে বৈষয়িক বুদ্ধিকেও ছাপিয়ে গেছে তাঁর অসীম সাহস—অমিতবিক্রম তেজ। এই তেজের কাছে কে না পরাভূত হয়েছে? এই তেজের জোরেই না তিনি গোটা সমাজের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন? ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মিশেছেন—সমানে-সমানে। মতান্তর হলে প্রতিবাদ, চাকরিতে ইস্তফা। ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে চোগা-চাপকান পরতে হয়নি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁকে চটি পরে ঢুকতে দেয়নি, তাই কোনোদিনই ঢোকেননি। বর্ধমান মহারাজার ভূমিদানের ইচ্ছা তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন বিদ্যাসাগরের ঋণের বোঝায় বিচলিত হয়ে 'সোমপ্রকাশ' জনগণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করল, তারও তিনি প্রতিবাদ করলেন। ঋণের ভার তাঁর ওপর এতটাই চেপে বসেছিল

যে এক সময়ে বুড়ো বয়সে আবার সরকারি চাকরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের চাকরি যখন হব-হব তখন তিনি তাঁর শর্ত দিলেন—তাঁর মাসিক মাইনে যেন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের থেকে কম না হয়। কী প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ! ঋণে মাথা নুয়ে যেতে পারে, কিন্তু মর্যাদার বিনিময়ে মাথা নোয়ানো নৈব নৈব চ।

এই কারণেই তিনি পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আত্মীয়দের আপত্তির কথা অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছ থেকে শুনে শম্ভুচন্দ্রকে লিখলেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম···এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।··· আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত যা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।' যে পুত্রের বিধবাবিবাহের জন্য তিনি সর্বাকছু ছাড়তে রাজি, আবার সেই পুত্র সম্পর্কেও তিনি তাঁর উইলে লেখেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য-অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি।'

শুধু পুত্র কেন? পিতা? পিতার প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা তো প্রবাদপ্রতিম! কিন্তু সেই পিতাকেও তিনি বলতে ছাড়েননি, 'আপনি ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট কিরূপে আপনাকে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন?' পিতা শ্রদ্ধেয় বলে তাঁর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করব না—বিদ্যাসাগরের অভিধানে এরকম কোনো কথা লেখা ছিল না।

বাঙালি তথা ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে একেবারে এই বেখাপ্পা বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় একজনই সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই বলতে শোনা যায়, 'আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

যে ব্যক্তি দেশাচারের দাস নন, যে ব্যক্তি অনায়াসে দেশাচারের নিগড়ের ওপর আক্রমণ হানতে পারেন তাঁর যদি 'অজেয় পৌরুষ' না থাকে তাহলে ওই কথাটাই তো অর্থহীন হয়ে যায়।

বর্তমান নিবন্ধটা (যদি একে আদৌ নিবন্ধ বলা চলে)-র আদ্যন্ত নানা বই থেকে স্রেফ টুকলি করা। অবশ্য একটু নিজের মতো করে সাজানো যাকে eclecticism বলা

যেতে পারে। আসলে বিনয় ঘোষ, ইন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিদ্বানগণ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা লিখে গিয়েছেন, তার বাইরে নতুন কথা বলতে গেলে যে বিদ্যে-বুদ্ধির প্রয়োজন তা বর্তমান কলমচির নেই। ভাল বিষয় অকেজো লোকের হাতে পড়লে যা হয়, বিদ্যাসাগরের দশাও এক্ষেত্রে সেইরকম। তবু শেষকালে নিজের কথা বলে দু' একটা শোনা কথা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছেটা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে বলে এই 'শেষের কথা'।

শেষ বিচারে, বিদ্যাসাগর ব্যর্থ—সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ—মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, আইনসিদ্ধ হলেও বিধবাবিবাহের বাস্তবে প্রচলনে ব্যর্থ, বাল্যবিবাহ রোধে বেশ কিছুটা ব্যর্থ, লোকশিক্ষায় ব্যর্থ, ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরিতে ব্যর্থ, আর নীতিনিষ্ঠ পৌরুষ সৃষ্টি—সে তো বাঙালির ধাতে সয় না! ওপরের এই ব্যর্থতার সত্যতা বিচারের জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয় না—বর্তমান সমাজই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রচিত নবম শ্রেণীর পাঠ্য 'Learning English, Step-III'-র ভূমিকায় লেখা হয়েছে 'The emphasis on reading and writing is deliberate. Our students will need to read, understand and write in English more and more as they grow older.'

অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যে অনেক ইংরেজি পড়তে হবে তা মানি। তা বলে সবাইকে? রামের মা, শ্যামের মা প্রভৃতি যাঁরা লোকের বাড়ি কাজ করে দিন গুজরান করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও? শ্রমিক-কৃষক সন্তানদেরও? অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদেরও? এ যদি বিদ্যাসাগরের মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা প্রসারের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা না হয় তো ব্যর্থতা কাকে বলব?

অবশ্য একটা ব্যাপারে বিদ্যাসাগর, বলা ভাল বিদ্যাসাগরের আদর্শ সফল—তা হল হিন্দুদের বহুবিবাহ বন্ধ করা। তাও অবশ্য বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় নয়, বর্তমান ভারত সরকার প্রণীত 'হিন্দু বিবাহ আইন'-এর কোঁকার চোটে। এখনও বহুবিবাহ হয় বটে, তবে তা কিছুটা লুকিয়ে-চুরিয়ে। অবশ্য আইন থাকলেও, কেবলমাত্র দরিদ্রশ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত কন্যাদেরও যে নির্ধারিত বয়সের আগেই বিবাহ দেওয়া হয়, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। আর 'জয় শ্রীরাম' রণধ্বনিতে মথিত ভারতের আসমুদ্র-হিমালয়ের একটু স্থানও যে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির থাকবে না—এটাই তো স্বাভাবিক! অবশ্য 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির আগেই পশ্চিমবঙ্গে রকমারি পুজোর ছটায় বিদ্যাসাগর-আদর্শ নির্বাপিত।

মধ্যবিত্ত-বিদ্যাসাগরের শ্রেণীবদ্ধতা প্রমাণে অনেকেই প্রয়াস পান—বলা যায় ফিল-হাল এটা একটা ফ্যাসনে পরিণত। আচ্ছা, বিদ্যাসাগর যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ছিলেন না বা স্বশ্রেণীর আঙিনার বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন—এমন দাবি কি কেউ করেছেন? মধ্যবিত্ত মানুষ—মধ্যবিত্তর দোষে-গুণে ভরা। এখন এইরকম একজন মধ্যবিত্ত মানুষের

কাজ তৎকালীন সমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণকর আর কতটা ক্ষতিকর, সেই কাজ কতটা আত্মস্বার্থবাহী আর কতটা নিস্বার্থ—এই বিচারটাই তো বেশি প্রয়োজনীয়। কেন জানি না এই সোজা পথটা গ্রহণে অনেকেই পরাঙ্মুখ।

একথা তো ঠিকই যে বিদ্যাসাগর প্রজাদের দুর্দশা সম্পর্কে নীরব ছিলেন, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে নিশ্চুপ। একথাও ঠিক যে, হরিশচন্দ্র মুখার্জি নীল বিদ্রোহের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এবং এটাও সত্য যে অক্ষয় দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে এবং প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। এ ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু এইসব লেখার জন্য কি উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন? আসলে আমরা একটা নির্দিষ্ট ছকে দেখতে মানুষকে পছন্দ করি। কিন্তু মানুষ তো ছক-বাঁধা প্রাণী নয়—তার ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। ঘটনাক্রমে প্রাগুক্ত চারজন ব্যক্তিই বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। অথচ তাঁরা ওইসব বিষয়ে লিখলেন, আর বিদ্যাসাগর নিশ্চুপ রইলেন। ওইসব লেখার পেছনে বিদ্যাসাগরের সায় ছিল কিনা তা জানার কোনো অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধির মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় স্থান পায়নি—এটাই সত্য। আর এই সত্য মেনে নিয়েই বিদ্যাসাগরের বিচার করা উচিত।

তবে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মানলে মনে হয় বিদ্যাসাগর কমপক্ষে মধ্যবিত্তদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'After a year's preparation the Indian Association was established on July 26, 1876... Pandit Iswar Chandra Vidyasagar and Mr. Justice Dwarka Nath Mitter, while still a member of the Bar, had formed the idea of organising a similar association which was to be the voice and the organ of the middle classes. The idea had to be given up as it did not at the time meet with much support.' *(A Nation In The Making)*

ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন যার বিকাশের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছিলেন অ্যালান অকটোভিয়ান হিউম। আর এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কিছুটা শারীরিক কারণ, হয়ত কিছুটা বা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতা (কারণ সুরেন্দ্রনাথ বেশি বেতনের জন্য মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ছেড়ে সিটি কলেজে যোগদান করেছিলেন), হয়ত বা অন্য কিছু কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করেননি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য যে, উদ্যোক্তারা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এবিষয়ে যথেষ্ট পরামর্শ পেয়েছিলেন।

কার্মাটাড়ের সাঁওতালদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর যে মনেপ্রাণে সুস্থ বোধ করতেন, সে কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার লিখেছেন, 'যদি বিদ্যাসাগর সেই দুমুখো

শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর উপর সুস্থ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ভর না করে সমাজের এই সাধারণ মানুষের উপর আস্থা নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন, বঞ্চিত মানুষের দুঃখকে একা দূর করবার স্বপ্ন না দেখে সেই বঞ্চিত সাধারণের উদ্যোগে তাদের বঞ্চনা অবসানের ব্রত গ্রহণ করতেন, তা হলে—একমাত্র তা হলেই তিনি তাঁর সমাজ সুনিশ্চিত আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে দিতে পারতেন ; আপন সাধনার সাফল্য লাভ করতেন।' ( প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পৃ. ৯১ )

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর মতের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করা ধৃষ্টতামাত্র। তবুও জিজ্ঞাসা করি—এটা কি মধ্যবিত্ত বিদ্যাসাগরকে টেনে প্রলেতারীয় করার চেষ্টা নয়? সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করে, তাঁদের সংগঠিত করে বাংলা গদ্য কি এগুতো? মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা কি হতো? মধ্যবিত্ত মানুষ কি সংস্কারমুক্ত হতেন? বিদ্বান শ্রীযুক্ত হালদারের কাছে বিনম্র চিত্তে নিবেদন—একবার স্মরণ করুন লেনিন 'What Is To Be Done'-এ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে কী লিখেছেন? এমনকি তিনি তাঁর যুক্তির সপক্ষে কার্ল কাউৎস্কির একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছেন (Lenin, Volume-V, P.P. 383-84)। কাউৎস্কির উদ্ধৃতির এক জায়গায় আছে—'The Vehicle of science is not proletariat, but the bourgeois intelligentsia'। ঈশ্বরচন্দ্রের মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, আর লেনিনের রচনার তখন তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিদ্যাসাগর তো একটা কাজেই তন-মন-ধন সঁপে দিয়েছিলেন—সংস্কারমুক্ত, হৃদয়বান-বিজ্ঞানের বাহক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করা। এ তো একেবারে গোড়ার কাজ। এই কাজ না করে সাঁওতালদের বা নিরন্ন কৃষকদের সংগঠিত করলে বিদ্যাসাগরের দ্বারা সমাজ বেশি উপকৃত হতো—এমন তো মনে হয় না। তাই সর্বপ্রকার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ সমালোচনাও কম নয় যে তিনি মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। উৎস—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা প্রাগুক্ত চিঠির এক জায়গায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'

আগে চিঠিটির পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল—সাধারণ গালিগালাজ থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্তর ব্যঙ্গ কবিতা ( বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১২২-২৫ ), এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপ। বহুবিবাহ রোধের প্রচেষ্টাও বঙ্গদর্শন সমালোচনাও করেছে। লোকে বিধবাবিবাহের নাম করে টাকা নিয়ে গিয়ে প্রতারণা করেছে। যাঁরা প্রথমে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তাঁরা একে-একে সরে পড়েছেন, অর্থ সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কথা রাখেননি। এইরকম একজন ঋণভারে জর্জরিত,

অপরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং প্রতারিত ব্যক্তির মুখ দিয়ে অনেক দুঃখে যে একথা বেরুতে পারে, সেটা কি অস্বাভাবিক? বিশেষত কে তাঁকে ঋণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখছেন? দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের যৌবনের সুহৃদ এবং যে দুর্গাচরণ নিজে বিধবাবিবাহের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ পুরোপুরি দেননি, তিনি যখন টাকার তাগাদা দেন, তখন বিদ্যাসাগরের এই আক্ষেপের কারণ একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মনে হয় কী? বিশেষত, উপরোক্ত শব্দাবলী কতটা দুর্গাচরণকে কটাক্ষ করে আর কতটা সাধারণ মানুষের ওপর অবিশ্বাস থেকে তাও ভেবে দেখার মতো।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বিদ্যাসাগর সজ্ঞানে 'আমাদের দেশের লোক'-কে অসার ও অপদার্থ বলেছেন তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তাঁরা কোন লোক? বিদ্যাসাগর যাঁদের দ্বারা বারবার প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে সমাজের কল্যাণের জন্য সৎ সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় তিনি দেখতে পাননি, তাঁরা তো সবাই মধ্যবিত্তশ্রেণীরই মানুষ। মানুষের ওপরই যদি বিশ্বাস হারাতেন তাঁকে কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হয় কেন? কেন তিনি সেখানকার মানুষদের চিকিৎসা করে, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ দান করে, পাড়িয়ে খাইয়ে তৃপ্ত হন? না, তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি; হারিয়েছিলেন স্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ওপর আস্থা। মানুষের ওপরে কী করে তিনি আস্থা হারাবেন? তাঁর কাছে তো 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'!

শেষ বয়সে বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ। পুত্রের ব্যভিচারের জন্য তার মুখ দেখা বন্ধ, ব্যক্তিগত কারণে 'বালের বারাণসী' বীরসিংহ দ্বারা পরিত্যক্ত, স্বশ্রেণীর-স্বগোত্রের সদস্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত! একমাত্র ভরসাস্থল, শান্তির স্থান কার্মাটাড়ের সাঁওতাল সম্প্রদায়। কিন্তু কী কারণে অতগুণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নিজশ্রেণী দ্বারা পরিত্যক্ত? একটা কারণ নিশ্চয়ই তাঁর সব ব্যাপারে একগুঁয়েমী, যাকে রামজয়ের কথা প্রতিধ্বনি করে ঠাকুরদাস বলতেন 'এঁড়েমি'। এটা ছিল তাঁর সহজাত প্রকৃতি যার জন্য তিনি অনেক সময়ই পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু যেটা অনেকেই উল্লেখ করেন না, তা হল তার এই 'এঁড়েমি' প্রশ্রয় পেয়েছিল মধ্যবিত্তজাত অহংবোধ দ্বারা। মধ্যবিত্ত মাত্রেই এই গুণটি আছে। কিন্তু প্রতিভাবান-কর্মঠ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই গুণটা যে মাত্রাতিরিক্তভাবেই ছিল তা ধরে নিলে বোধ হয় ভুল হয় না।

কিন্তু এটাই কি শুধু বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গতার কারণ? না কি স্বার্থের সংঘাতও ছিল? এবিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিহীন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি যা হয়ত এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। আগে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৮৩৫-এ তা বন্ধ হয়। সেকালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল একটি রক্ষণশীল পত্রিকা এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। ১৮৩৫-এ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ বলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখা হয়, 'সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।...

'এই সুসংবাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম……আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভ অবধি রহিত কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহু সংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতকগুলিন ব্রাহ্মণদের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড, পৃ. ৪)।

এই 'না কেরাণি হইল না অধ্যাপক' আবার যজমানও হারালো—এটাই মোদ্দা কথা। যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজের কেরানি অথবা সরকারি কর্তব্যক্তি হওয়ার জন্য আকুল, তখন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শেই কী লাভ আর সমাজ সংস্কারেই বা কী লাভ? আর যাই হোক বিধবাবিবাহ ঘটিয়ে না পাওয়া যাবে সরকারি চাকরি না খেতাব। শুধুই আত্মত্যাগ আর লাঞ্ছনা দিয়ে তো আর ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যাবে না! এখানেই ছিল মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংঘাতের কারণ নিহিত। তবুও সমাজের 'মুখ' লোকেরা যে মধ্যবিত্ত বিদ্যাসাগরের জন্য কোল পেতে দিয়েছিল তার প্রমাণ—'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে' পদ্য লেখা শান্তিপুরের তাঁতিদের তৈরি কাপড়! বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিন কলকাতার ছাত্রসমাজ পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে খালি পায়ে হেঁটেছিলেন এবং সারাদিন উপবাসে ছিলেন।

বিদ্যাসাগর সেকালেও ছিলেন নিঃসঙ্গ, একালেও। সমগ্র ভারতে, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে দু' লাইন স্থান পাওয়া ছাড়া, আজও তিনি অপরিচিত। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের শিক্ষিতজনের মধ্যে দু' চারজনই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন। দেশে কমপক্ষে আধ-ডজন সাম্যবাদী দল এবং অগুন্তি সাম্যবাদী গোষ্ঠী আছে। মুখে যাই বলুন, এইসব দল বা গোষ্ঠীর নেতারা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমান নিস্পৃহ। অবশ্য বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গতার কারণ সেকালেও যা ছিল, একালেও তাই আছে। বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তো সুবিধাবাদের স্থান নেই। ভাবতে অবাক লাগে, হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগে জন্মে যে ব্যক্তি ধর্মের প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখালেন এবং বেদান্ত সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন নামে অভিহিত করলেন, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রচারে সেই ব্যক্তির নাম ঘুণাক্ষরেও উচ্চারিত হয় না—হয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধর্মগুরুদের কথা! এ যুগে যাঁরা বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরসূরী হতে পারতেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। আর যাঁদের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদ্যাসাগরের শুধু অবয়বটাই প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর আজ তাঁদের হাতেই আটকা পড়ে আছেন। একেই বলে ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। □